পূর্ণাঙ্গ সহায়ক গ্রন্থ

আমার বাংলা

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

লেখক পরিচিতি

সুভাষ মুখোপাধ্যায় (১৯১৯-২০০৩) : জন্ম নদিয়ার কৃষ্ণনগরে। অধুনা বাংলাদেশের রাজশাহির নওগাঁয় যাওয়ার আগে পর্যন্ত সুভাষের শৈশব কেটেছিল কলকাতায়, ৫০ নম্বর নেবুতলার গলিতে। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে আবার কলকাতায় ফিরে মেজোকাকার বাসায়, বাঞ্ছারাম অক্রুর লেনে আশ্রয় নিলেন। ভরতি হলেন ক্লাস ফাইভে। মেট্রোপলিটন স্কুলে, বউবাজার শাখায়।

বিশ শতকের তিনের দশকে দুনিয়া জুড়ে দেখা দিয়েছিল ভয়ংকর অর্থনৈতিক সংকট। তার ঝাপটা লাগে তাঁদের পরিবারেও। বউবাজার থেকে তাদের উঠে আসতে হয় দক্ষিণের শহরতলিতে। সুভাষকে ভরতি হতে হয় সত্যভামা ইন্সটিটিউশনে, সপ্তম শ্রেণিতে। এরপর নবম শ্রেণিতে ভবানীপুর মিত্র ইনস্টিটিউশনে। ১৯৩৭ থেকে ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আশুতোষ কলেজে ও স্কটিশচার্চ কলেজে শিক্ষাগ্রহণ করেন। পরে দর্শন নিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম এ-তে ভরতি হলেও তুমুল রাজনৈতিক ব্যস্ততায় সুভাষের এম এ পরীক্ষা আর দেওয়া হয়ে ওঠেনি।

সত্যভামা ইনস্টিটিউশনের সপ্তম শ্রেণির ছাত্র থাকাকালীন স্কুল-ম্যাগাজিন *ফল্গু*-তে ছাপা 'কথিকা'-ই তাঁর প্রথম প্রকাশিত রচনা। সুভাষের কবিসত্তার প্রকৃত বিকাশ ঘটে বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতা' পত্রিকায়। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে 'কবিতাভবন' থেকে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'পদাতিক' প্রকাশিত হয়।

১৯৪৮-এ প্রকাশিত হয় সুভাষের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'অগ্নিকোণ'। ১৯৫০-এ বেরোয় 'চিরকুট'। 'হাংরাস' তাঁর প্রথম উপন্যাস, ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত। পাঁচ ও ছয়ের দশকে একের পর এক প্রকাশিত হয় নাজিম হিকমতের কবিতার বাংলা অনুবাদ, অনূদিত উপন্যাস *কত ক্ষুধা; রোজেনবার্গ পত্রগুচ্ছ; অক্ষরে অক্ষরে; কথার কথা; দেশবিদেশের রূপকথা; ছোটোদের জন্য সংক্ষেপিত বাঙালির ইতিহাস; ভূতের ব্যাগার; যত দূরেই যাই; কাল মধুমাস; যখন যেখানে; ডাকবাংলার ডায়েরি; নারদের ডায়ারি ; যেতে যেতে দেখা; রুশ গল্প সঞ্চয়ন।* সর্বোপরি ১৯৬১ থেকে ১৯৬৩ — তিন বছর সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে যৌথভাবে ছোটোদের বিখ্যাত সন্দেশ পত্রিকার নবপর্যায়ের সম্পাদনাও। ১৯৬৪-তে তিনি 'যত দূরেই যাই' কাব্যগ্রন্থের জন্য আকাদেমি পুরস্কার লাভ করেন। ছয়ের দশক থেকেই তিনি সংযুক্ত থাকেন 'আফ্রো-এশিয়ান রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশন'-এর বিভিন্ন রকম কাজে। এই সূত্রে পরিচিত হন বিশ্বের খ্যাতনামা কবি ও লেখকদের সঙ্গে। ১৯৭৭-এ অ্যাফ্রো-এশিয়ান রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশনের 'লোটাস' পুরস্কারে সম্মানিত হন। সাতের দশকে *এই ভাই; ছেলে গেছে বনে; একটু পা চালিয়ে ভাই* কাব্য-গ্রন্থ ছাড়াও প্রকাশিত হয় স্মরণীয় উপন্যাস *হ্যাংরাস; কে কোথায় যায়।* পরের দুই দশকে উল্লেখযোগ্য বই-এর মধ্যে রয়েছে, *ধর্মের কল; ফুল ফুটুক; পাবলো নেরুদার আরও কবিতা; হাফিজের কবিতা; অমুর শতক; গাথা সপ্তশতী অনুবাদ কাব্য, অন্তরীপ বা হানসনের অসুখ; কাঁচা-পাকা; কমরেড; কথা কও উপন্যাস; আবার ডাকবাংলার ডাকে; ঢোলগোবিন্দর আত্মদর্শন; ঢোলগোবিন্দর মনে ছিল এই; টানাপোড়েনের মাঝখানে; কবিতার বোঝাপড়া* প্রবন্ধগ্রন্থ। ছোটোদের জন্য তাঁর ছড়ার বই *'মিঁউয়ের জন্য ছড়ানো ছিটনো'*।

পরবর্তীকালের কাব্যগ্রন্থগুলি হলো 'যা রে কাগজের নৌকা'; 'ধর্মের কল'; 'ছড়ানো ঘুঁটি' প্রভৃতি। ১৯৮৮ সালে তিনি 'কবির পুরস্কার' লাভ করেন।

Scanned with CamScanner

কাশ্মীরের ছেলে

জলিমোহন কল-কে

সূ চি প ত্র

	ভূমিকা	৭৩
*	গারো পাহাড়ের নীচে	৭৪
*	ছাতির বদলে হাতি	৭৭
	দীপঙ্করের দেশে	৮০
	বন্যার সঙ্গে যুদ্ধ	৭৮
	শাল-মহুয়ার ছায়ায়	৯২
	পাতালপুরীর রাজ্যে	১০০
*	কলের কলকাতা	১০৫
	জগদ্দল পাথর	১১৮
	চাঁটগাঁয়ের কবিওয়ালা	১২৩
*	মেঘের গায়ে জেলখানা	১২৯
*	হাত বাড়াও	১৩৬

Scanned with CamScanner

ভূমিকা

বেশ ছিল।

শেয়ালদায় যাও। টিকিট কাটো। তারপর বেরিয়ে পড়ো উত্তরে কি পুবে—যখন যেখানে মন চায়। ভেড়ামারা পার হয়ে সাড়ার পুল। নীচে তাকিয়ে মনে হবে পদ্মার ঢেউগুলো যেন লাফিয়ে লাফিয়ে গিলতে আসছে। কিংবা যাও গোয়ালন্দে। ভাজা ইলিশের গন্ধ স্টিমারঘাট অব্দি পেছনে ডাকতে ডাকতে যাবে।

আজ জলেস্থলে গণ্ডি আঁকা। সে গণ্ডি পার হবার হুকুম নেই।

দিন বদলেছে।

শালগাছের ছায়ায় ছায়ায় আজ আর গোরা পল্টনের তাঁবু নেই। খালের দুপাশে চিক চিক করে না মানুষের হাড়। লরির রাস্তায় এখন পত্তন হচ্ছে নতুন নতুন গঞ্জ। স্বাধীন দেশে মানুষ এখন নতুন করে দল বাঁধছে, নতুন করে শপথ নিচ্ছে, নতুন করে স্বপ্ন দেখছে সুখশান্তির।

শীতের হাওয়া দিলে আজও দাফা-র কথা মনে পড়ে। মাটির ঘরে কাঁথা গায়ে দিয়ে কাঁপছি। কপাটহীন জানালা-দরজা দিয়ে দেখছি জ্যোৎস্না গায়ে মেখে দূরে দাঁড়িয়ে আছে গারো পাহাড়। আমি তক্তাপোষে আর দাফা মেঝেতে। ঠান্ডায় দুজনেরই চোখে ঘুম নেই।

তিন কুলে কেউ ছিল না তার। কোথায় ছিল তার ঘরবাড়ি, কে ছিল তার মা-বাবা—কিছুই জানে না দাফা। ছেলেবেলায় সে ছিল গোরুচোর। সারা গায়ে তার মারের দাগ। দাফা বদলে গেল ললিতের বাড়িতে এসে। ললিতই তাকে রাস্তা থেকে ধরে এনেছিল। দাফাকে দেওয়া হলো গোরুর রাখালি। ললিতের বউকে দাফা মা বলে ডাকল। দাফা হয়ে গেল ললিতের ছেলের মতো। দাফাকে সবাই হাবাগোবা বলেই জানত। সেই দাফা পড়তে শিখল। সমিতির ঝান্ডা নিয়ে প্রচারে যাওয়া, হাটে হ্যান্ডবিল বিলি করা, চোঙা ফোঁকা—সব কাজেই দাফা-র ডাক পড়ে।

তার খুব ইচ্ছে একবার শহরে যাওয়ার। রেলগাড়ি কখনও সে দেখেনি। শহরে নাকি খুব আলো?

কলকাতায় ফিরে এলাম। তারপর কটা বছর কাটাকাটি ভাগাভাগি—কী আতান্তরেই না কেটেছে।

হঠাৎ একদিন শুনলাম বুকে গুলি লেগে দাফা মারা গেছে। লড়েছিল খুব জোর। কিন্তু বন্দুকের সঙ্গে পারেনি। দাফা মরতে চায়নি, চেয়েছিল মানুষের মতো মাথা উঁচু করে বাঁচতে।

'শহরে নাকি খুব আলো?'—এখনও কানে বাজছে।

শুধু কি দাফা? শুধু কি সেই পাহাড়তলী? সারা বাংলাদেশই সেদিন এমনি ছিল।

সেই এক-যে ছিল বাংলাদেশে যা দেখেছি যা শুনেছি তাই নিয়ে 'আমার বাংলা'। বন্ধু দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় 'রংমশালে' জোর করে না লেখালে কোনোদিনই হয়তো এ বই লেখা হতো না। এ বই পড়ে লোকের ভালো লাগবে কে জানত?

০১.০৬.১৯৬১

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

Scanned with CamScanner

গারো পাহাড়ের নীচে

চৈত্র মাসে যদি কখনও মৈমনসিং যাও, রাত্তিরে উত্তর শিয়রে তাকাবে। দেখবে যেন একরাশ ধোঁয়াটে মেঘে কারা আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। ভয় পাবার কিছু নেই; আসলে ওটা মেঘ নয়, গারো পাহাড়।

গারো পাহাড়ে যারা থাকে, বছরের এই সময়টা তারা চাষবাস করে। তাদের হাল নেই, বলদ নেই– তাছাড়া পাহাড়ের ওপর তো শুধু গাছ আর পাথর। মাটি কোথায় যে চাষ করবে?

তবু তারা ফসল ফলায়–নইলে সারা বছর কী খেয়ে বাঁচবে? তাই বছরে এমনি সময় শুকনো ঝোপে ঝাড়ে তারা আগুন লাগিয়ে দেয়। সে কি যে-সে আগুন? যেন রাবণের চিতা–জ্বলছে তো জ্বলছেই। বছরের এমনি সময় যেন বনজঙ্গলের গাছপালারাও ভয়ে শুকিয়ে কাঠ হয়ে থাকে।

জঙ্গলে যখন আগুন লাগে তখন হয় মজা। বনের যত দুর্ধর্ষ জানোয়ার প্রাণ নিয়ে পালাই-পালাই করে। বাঘ-অজগর, হরিণ-শুয়োর যে যেদিকে পারে ছোটে। আর পাহাড়ি মেয়ে-পুরুষরা সেই সুযোগে মনের সুখে হরিণ আর শুয়োর মারে। তারপর সন্ধেবেলা শিকার সেরে গোল হয়ে ঘিরে নাচ আর গান।

এদিকে আস্তে আস্তে গোটা বন পুড়ে ছাই হয়ে যায়। পাথরের ওপর পুরু হয়ে পড়ে কালো ছাইয়ের পলেস্তারা, তার ওপর বীজ ছড়াতে যা সময়। দেখতে দেখতে সেই পোড়া জমির ওপর সবুজ রং ধরে–মাথা চাড়া দেয় ধান, তামাক, আর কত ফসল।

Scanned with CamScanner

আমরা এই লোকগুলোর এক কাছে থেকেও পর; শুধু জানি, উত্তর দিকের আকাশটা বছরের শেষে একবার দপ্ করে জ্বলে ওঠে—দূরের আশ্চর্য মানুষগুলো তারপর কখন যে মেঘের রঙে মিলিয়ে যায় তার খবর রাখি না।

কাছাকাছি গিয়েছিলাম একবার।

গারো পাহাড়ের ঠিক নীচেই সুসং পরগনা। রেললাইন থেকে অনেকটা দূরে। গাড়ি যাবার যে রাস্তা, সে-রাস্তায় যদি কখনও যাও কান্না পাবে। তার চেয়ে হেঁটে যেতে অনেক আরাম।

সুসং শহরের গা দিয়ে গেছে সোমেশ্বর নদী। শীতকালে দেখতে ভারি শান্তশিষ্ট—কোথাও কোথাও মনে হবে হেঁটেই পার হই। কিন্তু যেই জলে পা দিয়েছি, অমনি মনে হবে যেন পায়ে দড়ি দিয়ে কেউ টেনে নিয়ে যাচ্ছে। স্রোত তো নয়, যেন কুমিরের দাঁত। পাহাড়ি নদী সোমেশ্বরী—সর্বদা যেন রেগে টং হয়ে আছে!

তার চেয়ে ফেরি আছে, গোরু-ঘোড়া-মানুষ একসঙ্গে দিব্যি আরামে পার হও। হিন্দুস্থানি মাঝির মেজাজ যদি ভালো থাকে, তোমার কাছ থেকে দেশবিদেশের হালচাল জেনে নেবে। হয়তো গর্ব করে বলবে, তার যে বিহারি মনিব, বাংলার সব ফেরিঘাটেরই সে মালিক।

পাহাড়ের নীচে যারা থাকে, তারা আমাদেরই মতো হালবলদ নিয়ে চাষ-আবাদ করে। মুখচোখে তাদের পাহাড়ি ছাপ। হাজং-গারো-কোচ-বানাই-ডালু-মার্গান এমনি সব নানা ধরনের জাত। গারোদের আলাদা ভাষা; হাজং-ডালুদের ভাষা যদিও বাংলা, কিন্তু তাদের উচ্চারণ আমাদের কানে একটু অদ্ভুত ঠেকে। 'ত'-কে তারা 'ট' বলে, 'ট'-কে 'ত'; আবার 'ড'-কে তারা 'দ' বলে, 'দ'-কে 'ড'। প্রথম শুনলে ভারি হাসি পাবে। ভাবো তো, তোমার কাকার বয়সের একজন হৃষ্টপুষ্ট লোক দুধকে ডুড বলছে, তামাককে টামাক।

এ-অঞ্চলের গারোদের ঘর দূর থেকে দেখলেই চেনা যায়। মাচা করে ঘর বাঁধা। মাচার ওপরে যেখানেই শোয়া, সেখানেই রান্নাবান্না সবকিছু। হাঁসমুরগিও এই উচ্চাসনেই থাকে। এটা হচ্ছে পাহাড়ি স্বভাব। বুনো জন্তুজানোয়ারের ভয়েই এই ব্যবস্থা।

এই অঞ্চলের হাজংরাই সংখ্যায় সব চেয়ে বেশি। 'হাজং' কথার মানে নাকি 'পোকা'। তাদের মতে, পাহাড়তলীর এই অঞ্চলে হাজংরাই প্রথম আসে; আর তখন চাষবাসে তাদের জুড়ি নাকি আর কেউ ছিল না। পাহাড়ি গারোরা তাই তারিফ করে তাদের নাম দিয়েছে হাজং—অর্থাৎ চাষের পোকা।

ধানের ক্ষেত দেখলে কথাটা বিশ্বাস না করে উপায় নেই। একটু কষ্ট করে যদি পাহাড়ে না হোক একটা টিলার ওপরেও ওঠো—নীচের দিকে তাকালে দেখবে পৃথিবীটা সবুজ। যতদূর দেখা যায় শুধু ধান আর ধান— একটা সীমাহীন নীল সমুদ্র যেন আহ্লাদে হঠাৎ সবুজ হয়ে গেছে।

এত ফসল, এত প্রাচুর্য— তবু কিন্তু মানুষগুলোর দিকে তাকালে মনে হয় জীবনে তাদের শান্তি নেই। একটা দুষ্টু শনি কোথাও কোন্ আনাচে যেন লুকিয়ে আছে। ধান কাটার সময় বাড়ির মেয়ে-পুরুষ সবাই কাস্তে নিয়ে মাঠে ছুটবে; পিঠে আঁটি-বাঁধা ধান নিয়ে ছোটো ছোটো ছেলের দল কুঁজো হয়ে খামারে জুটবে। কিন্তু মাঠ থেকে যা তোলে, তার সবটা ঘরে থাকে না। পাওনাগন্ডা আদায় করতে আসে জমিদারের পাইক-বরকন্দাজ। সে এক মজার ধাঁধা তখন তারা গালে হাত দিয়ে যেন বলে:

Scanned with CamScanner

বড়োই ধাঁধায় পড়েছি, মিতে—
ছেলেবেলা থেকে রয়েছি গ্রামে;
বারবার ধান বুনে জমিতে
মনে ভাবি বাঁচা যাবে আরামে।
মাঠ ভরে যেই পাকা ফসলে
সুখে ধরি গান ছেলেবুড়োতে।
একদা কাস্তে নিই সকলে।
লাঠির আগায় পাড়া জুড়োতে
তারপর পালে আসে পেয়াদা
খালি পেটে তাই লাগছে ধাঁধা।।

গাঁয়ের আল-বাঁধা রাস্তায় লোহার-খুর-লাগানো নাগরায় শব্দ হয় খট খটাখট—দূর থেকে বাঁশের মোটা লাঠির ডগা দেখা যায়। ছোটো ছোটো ছেলের দল ভয়ে মায়ের আঁচল চেপে ধরে। খিটখিটে বুড়িরা শাপমুন্নি দিতে থাকে। জমিদারকে টক্ক দিতে গিয়ে চাষিরা ফকির হয়।

পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে এ-অঞ্চলে জমিদারের একটা আইন ছিল—তাকে বলা হতো হাতিবেগার। জমিদারের বেজায় শখ হাতি ধরার। তার জন্য পাহাড়ে বাঁধা হবে মাচা। মাচার ওপর সেপাইসান্ত্রী নিয়ে নিরিবিলিতে বসবেন জমিদার; সেই সঙ্গে পান থেকে চুন না খসে তার ঢালাও ব্যবস্থা। আর প্রত্যেক গাঁ থেকে প্রজাদের আসতে হবে নিজের নিজের চালচিঁড়ে বেঁধে। যে জঙ্গলে হাতি আছে, সেই জঙ্গল বেড় দিয়ে দাঁড়াতে হবে। ছেলে হোক বুড়ো হোক কারো মাপ নেই। যারা হাতি বেড় দিতে যেত, তাদের কাউকে সাপের মুখে, কাউকে বাঘের মুখে প্রাণ দিতে হতো।

মানুষ কতদিন এসব সহ্য করতে পারে? তাই প্রজারা বিদ্রোহী হয়ে উঠল। গোরাচাঁদ মাস্টার হলেন তাদের নেতা। চাকলায় চাকলায় বসল মিটিং, কামারশালায় তৈরি হতে লাগল মারাত্মক অস্ত্রসস্ত্র। শেষ পর্যন্ত জমিদারের পল্টনের হাতে প্রজাদের হার হলো। কিন্তু হাতি-বেগার আর চলল না।

এখনও চৈতননগরে, হিঙুরকোণায় গেলে খগ মোড়ল, আমুতো মোড়লের বংশধরদের মুখে বিদ্রোহের গল্প শোনা যায়। থুরথুরে বুড়ো যারা, তারা দুখ্যু করে বলে, সেকালে সর্ষের ক্ষেতে আমরা লুকোচুরি খেলতাম; মাঠে এত ধান হতো যে কাকপক্ষীরও অরুচি ধরত। গোয়ালে থাকত ষাট-সত্তরটা গোরু; নর্দমায় দুধ ঢালাই হতো। আর এখন? এক ফোঁটা দুধের জন্যে পরের দুয়োরে হাত পাততে হয়।

একটা কথা আগে থেকে বলে রাখি। ও-অঞ্চলে যদি কখনও যাও, ওরা তোমাকে 'বাঙাল' বলবে। চটে যেয়ো না যেন। বাঙাল মানে বাঙালি। বাংলাদেশে থাকলেও ওদের আমরা আপন করে নিইনি—তাই ওরাও আমাদের পর-পর ভাবে।

অথচ আমরা সবাই বাংলাদেশেরই মানুষ।

Scanned with CamScanner

ছাতির বদলে হাতি

নাকের বদলে নরুন পেলাম টাক্ ডুমা ডুম ডুম। কিন্তু শুধু একটা ছাতির বদলে এক নয়, দুই নয় একবারে তিন বারোং ছত্রিশ বিঘে জমি—নাকের বদলে নরুন তো তার কাছে কিছুই নয়। বিশ্বাস না হয়, বেশ, একবার হালুয়াঘাট বন্দরে যেয়ো। সেখানে মনমোহন মহাজনের গদিতে গেলেই বুঝবে কী তেজ বন্ধকি-তেজারতির। মনমোহন মহাজন গত হয়েছেন অনেক দিন; কিন্তু সেই মহাজনের পন্থা আজও টিকে আছে।

পঁচিশ-ত্রিশ বছর আগেকার কথা। হালুয়াঘাট বন্দরে গারো পাহাড়ের নীচের এক গাঁ থেকে সওদায় এসেছিল এক গারো চাষি। নাম তার চেংমান। এমন সময় দেও-দেবতা স্তম্ভিত, দিক- পৃথিবী কম্পিত করে মুষলধারে বৃষ্টি। সে বৃষ্টি ধরবার কোনো লক্ষণই নেই।

এদিকে দিন তো হেলে, রাত তো টলে—বাড়ি ফেরার উপায় কী? মনমোহন মহাজনের দোকানের ঝাঁপির নীচে চেংমান আশ্রয় নিয়েছিল।

হঠাৎ মহাজন যেন করুণার অবতার হয়ে উঠল। একেবারে খাস কলকাতা থেকে খরিদ-করে আনা আনকোরা নতুন একটা ছাতা চেংমানের মাথার ওপর মেলে দিয়ে মনমোহন বলল : 'যা যা, ছাতিটা নিয়ে বাড়ি চলে যা। নিজে ভিজিস তাতে কিছু নয়, কিন্তু এতগুলো পয়সার সওদা যে ভিজে পয়মাল হয়ে যাবে।'

মহাজনের দরদ হঠাৎ কীসে এত উতলে উঠল? চেংমান দোমনা হয়ে ভাবছে নেব কি নেব না। নিশ্চয় অনেক দাম। হাতে পয়সাও তো নেই।

Scanned with CamScanner

'নগদ পয়সা নাই বা দিলে। যখন তোমার সুবিধে হবে দিয়ে গেলেই হলো। ওর জন্যে কিছু ভেবো না।'—মনমোহন ভরসা দেয়।

চেংমান ভাবল এমন সুযোগ ছাড়া উচিত নয়। নতুন ছাতি মাথায় দিয়ে মহাফুর্তিতে বাড়ির দিকে সে চলল। ছেলে-পুলে-বউ তার পথ চেয়ে বসে আছে। চেংমান গেলে তবে হাঁড়ি চড়বে।

চেংমান ফি বার হাটে যায়। মনমোহনকে বলে, 'বাবু, পাওনাগন্ডা মিটায়ে নেন।' মনমোহন ফি বারই বলে, 'আহা-হা অত তাড়া কীসের, সে দিও ক্ষণ পরে।' এমনি করে বছর, তারপর বছর যায়। ধার করে ছাতি কেনার কথা চেংমান ভুলেই গেল। হঠাৎ একদিন হাটবারে মনমোহন চেংমানকে পাকড়াও করে। '—কী বাছাধন, বড়ো পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছ। পাওনা মিটিয়ে দিয়ে যাও।' মনমোহনের কথায় চেংমানের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। চেংমান বুঝতে পারে এবার সে ইঁদুরকলে পড়েছে।

মনমোহন তার লাল খেরোয় বাঁধানো জাবদা খাতা বার করে যা পাওনা হিসেব দেখাল, তাতে চেংমানের চোখ কপালে উঠল। এই ক-বছরে চক্রবৃদ্ধিহারে ছাতির দাম বাবদ সুদসমেত পাওনা হয়েছে হাজার খানেক টাকা। প্রায় একটা হাতির দাম।

বিশ্বাস করো, বানানো গল্প নয়। যদি যাও ও-অঞ্চলে, পাকাচুল প্রত্যেকটা ডালু-হাজং-গারো চাষি এর সাক্ষী দেবে।

ডালুদের গ্রাম কুমারগাঁতির নিবেদন সরকারের মুদিখানায় দু-দশ বছর বাকিতে মশলাপাতি কেনার জন্যে নিবেদনের ছেষট্টি বিঘে জমি মহাজন কুটিশ্বর সাহা এমনিভাবে দেনার দায়ে কেড়ে নিয়েছে। আরেক ধুরন্ধর মহাজন এক চাষিকে ধারে কোদাল দিয়ে পরে তার কাছ থেকে পনেরো বিঘে জমি মোচড় দিয়ে নিয়েছিল।

ও-অঞ্চলের পঞ্চাশটা গ্রামে ডালুদের বাস। কথাবার্তায় পোশাক-পরিচ্ছদে হাজংদের সঙ্গে এদের খুব বেশি মিল। কে ডালু, কে হাজং বোঝাই যায় না। কিন্তু ডালুদের জিজ্ঞেস করো, ওরা বলবে—হাজংরা জাতে ছোটো। হাজংরাও আবার ঠিক উলটো বলবে।

ডালুরা বলে, সে দিন আর নেই। আগে ছিল তারা অন্ধ বোকার জাত। পাহাড়ের নীচে যেদিন থেকে লাল নিশান খুঁটি গেড়েছে, সেই দিন থেকে তাদের চোখ ফুটেছে।

সে এক দিন ছিল বটে। শুধু মনমোহন মহাজন আর কুটিশ্বর সাহাই নয়— ছিল জোতদার আর তালুকদারদের নিরঙ্কুশ শাসন। আর সেই সঙ্গে ব্রিটিশ সিংহের দাপট। সিংহ—যার ভালো নাম পশুরাজ।

জমিদারের খামারে জমির ধান তুলতে হবে। জমিদারের পাওনা মিটিয়ে তবে চাষি তার ঘরে ধান নিয়ে যেতে পারত। চুক্তির ধান তো বটেই, কার ওপর কর্জার ধান শোধ দিতে হতো টাকায় এক মণ হিসেবে। তাছাড়া আছে হাজার রকমের বাজে আবওয়াব। অর্থাৎ খাজনার চেয়ে বাজনা বেশি। যে চাষি বুকের রক্ত জল করে এত কষ্টে ফসল ফলাল শেষটায় তাকে শুধু পালা হাতে করে ঘরে ফিরতে হতো।

এদিকে আর এক রকমের প্রথা আছে—নানকার প্রথা। নানকার প্রজাদের জমিতে স্বত্ব ছিল না। জমির আমকাঁঠালে তাদের অধিকার ছিল না। জমি জরিপের পর আড়াই টাকা পর্যন্ত খাজনা সাব্যস্ত হতো। খাজনা দিতে না পারলে

Scanned with CamScanner

তহশিলদার প্রজাদের কাছারিতে ধরে নিয়ে যেত, পিছমোড়া করে বেঁধে মারত; তারপর মালঘরে আটকে রাখত। নিলামে সব সম্পত্তি খাস করে নিত। মহাজনেরা কর্জা ধানে এক মণে দু-মণ সুদ আদায় করত।

কিন্তু নওয়াপাড়া আর দুমনাকুড়া, ঘোষপাড়া আর ভুবনকুড়ার বিরাট তল্লাটে ডালু চাষিরা আজ জেগে উঠেছে। তারা বলেছে, জমিদারের খামারে আমরা ধান তুলব না। ধান তারা তোলেনি। পুলিশ-কাছারি কিছুতেই কিছু হয়নি। শেষে জমিদার হার মেনেছে।

আজ তারা গর্ব করে বলে, বন্দরের ভদ্রলোকেরা আজ আর আমাদের তুই-তুকারি করতে সাহস পায় না। 'আপনি' বলে সম্ভাষণ করে। থানায় চেয়ার ছেড়ে দেয় বসতে। আমরাও অনেক সভ্য হয়েছি। আগে বাপ-ছেলে একসঙ্গে বসে মদ খেত, এখন মদ খাওয়া সমাজের চোখে খুবই লজ্জার বিষয়।

হালবলদের অভাবে চাষ-আবাদের আজকাল বেজায় মুশকিল। এখানকার চাষিরা তাই সবাই মিলে গাঁতায় চাষ করে। চাষ করতে করতে ওরা ছেলেমেয়েরা মিলে গান ধরে :

শুনো শুনো বন্ধু গো ভায়া
রোয়া লাগাইতে চলোগো এলা।
বন্ধুর জমিখানি দাহাকোণা
হাল জরিছে মৈষমেনা
হাল বো আছে
নি' উথি মাতি রে
কত বা লাগাব নিতি নিতি,...

চলো বন্ধু! এখন রোয়া লাগাতে যাই। পাহাড়ের নীচে আমাদের জমি; হালের ভারে মোষের শিং নুয়ে পড়েছে। আমরা হাল বাইছি ভাই, আমরা হাল বাইছি। কিন্তু কঠিন মাটি উঠতে চায় না। কী কষ্ট! কী কষ্ট!

যারা এত কষ্ট করে আমাদের মুখে অন্ন জোগায়—ইচ্ছে করে, জমিদারের হাত থেকে বাংলার সমস্ত জমি তাদের হাতে দিই, মহাজনের নিষ্ঠুর ঋণের বোঝা থেকে তাদের মুক্তি দিই। তোমাদের কি ইচ্ছে হয় না?

Scanned with CamScanner